ধর্মীয় মৌলবাদ ঠেকাতে বামপন্থীরা ব্যার্থ কেন?

-বিপ্লব পাল ৬/১২/০৮

(১)

ট্রেন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতে ইন্টারনেট ই রাজনীতির ভবিষ্যত। ব্লগার, ইউটীউব, স্যোসালনেটওয়ার্কিং-এগুলো আস্তে আস্তে টিভি ক্যাম্পেইন, দেওয়াল লিখন, নিউজপেপার ভিত্তিক রাজনীতির উত্তরাধিকারী। এবার ওবামার জয়, ইন্টারনেট মিডিয়ার ক্ষমতায়নের জ্যান্ত প্রমান। যদিও ভারত বা বাংলাদেশে এমন হতে ঘোর দেরী-রাজনৈতিক আলোচনা এবং বিতর্কে ইন্টারনেট এখানেও এখন সেরা মিডিয়া। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যা ছিল গুটিকয় কিছু বাঙালীর সংগঠন-এখন ইন্টারনেট মাধ্যমেই বাঙালীর রাজনীতির সবথেকে বেশী চর্চা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের দিকের ইন্টারনেট রাজনীতি চারটি ভাগে বিভক্ত-বাম (সিপিএম), অতিবাম (নক্সাল) , এনার্কিস্ট প্রগ্রেসিভ (যারা দক্ষিন পন্থী, বামপন্থী উভয় রাজনীতি বিরোধি) এবং হিন্দুত্ববাদি দক্ষিনপন্থী। বাংলাদেশের দিকে মূলত তিনটি গ্রুপ দেখি-দক্ষিনপন্থী ইসলামিক জাতিয়তাবাদি, সাবেকি বামপন্থি এবং নতুন প্রজন্মের প্রগ্রেসিভ বুদ্ধিজীবি। বাংলাদেশের ধর্ম নিরেপেক্ষ শক্তিটির মধ্যে দুটি ভাগ-প্রথমটি বাম ঐতিহ্যের ঘরানা, যারা মূলত শ্রেনীগত অবস্থান এবং শ্রেনীদ্বন্দ ভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখেন। আবার ইসলামের বিরুদ্ধেও তারা যাবেন না--বরং এদের অনেকেই মনে করে ইসলাম সাম্যবাদি শক্তির সহায়ক এবং ইসলামিক মৌলবাদ তথা সন্ত্রাসবাদের উত্থানের পেছনে সবদোষ আমেরিকার। ইসলাম তথা মুসলমানদের কোন দোষ নাই-তারা সাম্রাজ্যবাদি শক্তির বোরে মাত্র। বা আরেকটু এগিয়ে গিয়ে অনেকেই মনে করেন, ইসলাম সাম্রাজ্যবাদি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পশ্চিম বঙ্গের বামপন্থি (সিপিএম) গোর্ষ্ঠিটিও ইসলাম সম্মন্ধে একই মত পোষন করে। তবে হিন্দুত্ববাদি শক্তির বিরুদ্ধে তারা কঠোর। কিন্ত তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেওয়াই- পশ্চিমবংগের নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রগ্রেসিভ এনার্কিস্টরা দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে যারা সব ধর্মকে নুইসেন্স বলেই মনে করে। এবং নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিমান বিবেকবান বাঙালীরা, ধর্ম নিয়ে সিপিএমের সুবিধাবাদি অবস্থানের সাথে কখনোই একমত হবে না। বাংলাদেশেও এই ভাবে ধর্মনিরেপেক্ষ আন্দোলনে "ধর্ম বিরোধী ধর্মনিরেপেক্ষ" গ্রুপ গড়ে উঠছে-যারা ধর্ম ভালো, ধার্মিক খারাপ জাতীয় সুগারকোট দিয়ে ধর্মীয় শক্তিকে তোষন করার নীতির বিরোধিতা করছে। ভারতের দিকের বাঙালীদের এটা বিশাল সমস্যা-যারা প্রগ্রেসিভ কিন্ত বামপন্থীদের ইসলাম তোষনে বিরক্ত-তাদের সবাই যে পগ্রেসিভ ব্লকে আসছে তা নই-বরং একটা বড় অংশ, ইসলাম বিরোধিতা করতে গিয়ে হিন্দুত্ববাদি রাজনীতির শরিক হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখের। কারন হিন্দুত্ববাদি রাজনীতি করে আসলেই ইসলামিক মৌলবাদকে উস্কে দেওয়া হয়। ধর্মের বিরুদ্ধে পরিস্কার অবস্থান না নিলে, বামপন্থী শক্তির যে ভিত্তি-তরুণ প্রজন্মের বিদ্রোহী চেতনা-সেখানে ধ্বস নামবে। দক্ষিন পন্থী শক্তিগুলি ভারত এবং বাংলাদেশের বামপন্থীদের এই ব্যার্থতার সুযোগ নিচ্ছে। ভারত এবং বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থানের পেছনে, বামপন্থীদের এই ধর্মর সাথে আপোস করে চলার নীতিকেই আমি প্রথম দোষারোপ করব। কারন দক্ষিনপন্থি শক্তি তার কাজ করবেই-কিন্ত বামপন্থীরা যদি তার বিরুদ্ধে সঠিক অবস্থান না নিতে পারে-বিক্ষুব্ধ তরুন প্রজন্ম দক্ষিনপন্থী রাজনীতির দিকেই ঘেঁসবে। ভারতে বিজেপির উত্থানের পেছনে এটাকেই আমি সবথেকে বড় কারন বলে মনে করি। বিজেপির সবাই যে "রামনাম নেওয়া" হিন্দু তা না-বরং একটা বড় অংশই নাস্তিক, গরু খাওয়া পার্টি। ধর্মে মোটেও বিশ্বাস নেই। এদের ত প্রগ্রেসিভ ব্লকে থাকা উচিত-কিন্ত সেই ভিত্তিটা আমরা হারাচ্ছি। ধর্ম নিয়ে বামপন্থীর ভুল অবস্থান-এই সুযোগ করে দিচ্ছে-ধর্মনিরেপেক্ষ শক্তিকে দুর্বল করছে। এই প্রবন্ধে বামপন্থীদের ভুলের ঐতিহাসিক এবং তাত্বিক বিশ্লেষন করব।

(২)

ভারতে কমিনিউস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজফর আহমেদ। ধর্ম নিয়ে তার অবস্থানে ভুল ছিল একথা বলা যাবে না। উনি প্রথম যৌবনে ধর্ম ভিত্তিক খিলাফৎ আন্দোলনে জড়িয়েছিলেন। ইসলামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি অবস্থান যে আসলেই মুসলিম এলিটদের শক্তিশালী করার আন্দোলন এবং তাতে গরীব মুসলমানদের লাভের বদলে ক্ষতি বেশী-এটা বুঝেই খিলফৎ আন্দোলন ছেড়ে ভারতে বলশেভিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে কমিনিউস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন কাকাবাবু। ইসলামকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি আন্দোলনের আসল শ্রেণী অবস্থান -অর্থাৎ জমিদার এবং উচ্চশিক্ষিত মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত খিলাফত আন্দোলন আসলেই যে মুসলমানদের মধ্যে সুবিধাভোগী শ্রেণীটির ক্ষমতায়নের প্রয়াস-সেটা বিলক্ষন বুঝেই গরীব মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি বলশেভিক মতাদর্শের দিকেই ঝুঁকলেন। এবং পরিষ্কার বুঝেছিলেন গরীব মুসলমান প্রজাদের মধ্যে হিন্দু জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত আছে-যা আসলেই শ্রেনীদ্বন্দ ছারা কিছু নয়-তা অচিরেই সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেবে এবং মুসলিমলীগ এর সুযোগ নেবে।

ইসলাম ভিত্তিক প্রতিবাদি আন্দোলন যে গরীব মুসলমান প্রজাদের স্বার্থ বিরোধি-সেই অবস্থান থেকেই কৃষক প্রজা পার্টির জন্ম মূলত জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটাতে (১৯৩০)। কৃষক প্রজা পার্টির বামপন্থি ভিত্তি তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়ল-যখন ফজলুল হক ক্ষমতার লোভে ১৯৩৭ সালে মুসলীম লীগের সাথে হাত মিলিয়ে মন্ত্রীসভা দখল করলেন। ফলে সামসুদ্দিন আহমদের মতন নেতারা ক্ষমতা লোভেই হোক বা ধর্ম নিরেপেক্ষতার জন্যেই হোক ফজলুল হকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। ফজলুল হক মুসলীম লীগের '৩৭ সালের লক্ষৌ সেসনে,সরাসরি মুসলীম লীগে যোগ দিলেন। সামসুদ্দিন আহমেদ ও প্রবল মুসলিম জোয়ারের বেগ আটকাতে পারলেন না-

ক্ষমতার লোভে তিনিও সেই দিকেই গা ভাসালেন। অর্থাৎ বাঙালি তথা বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে গড়ে ওঠা প্রথম বামপন্থি শক্তিশালী আন্দোলনকে ধর্মীয় শক্তি খেয়ে ফেললো। কারন? মুসলীম লীগকে দোষ দেবেন? না ফজলুল হককে দোষ দেবেন? পার্থক্যটাই বা কি? ইতিহাস বলছে মুসলীম লীগ এবং ফজলুল হক ক্ষমতার খেলাটাই খেলছিলেন। কেও ইসলাম বা কেও গরীব প্রজাদের কথাটা সামনে রেখে বোরে সাজাচ্ছিলেন। ফলে ফজলুক হক তার শ্রেনীগত অবস্থানের সুবিধার জন্যে একদিন না একদিন মুসলীমে লীগে পা রাখতেন ই। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি? মুসলমান প্রজাদের জমিদারদের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ-যা ছিল শ্রেণী দ্বন্দ -সেটা কৃষক প্রজা পার্টির সাহায্যে মুসলীম লীগ হাইজ্যাক করে এবং দ্বিজাতি তত্বকে গরীব মুসলমান প্রজাদের মধ্যে ছড়াতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ বাঙালীর ইতিহাসে আমরা প্রথম থেকেই দেখবো ইসলামিক বামপন্থা-আসলেই মুসলমান প্রজাদের শ্রেনীদ্বন্দকে হাইজ্যাক করে তা প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিন পন্থী ইসলামিক শক্তির হাতে তুলে দিয়েছে। মিশর, ইরাক, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া-সর্বত্রই ইসলামিক বামপন্থার এটাই আসল ইতিহাস। নাশেরিজম গোটা আরববিশ্বে একসময় প্রবল জনপ্রিয় হয় (১৯৫০-১৯৮০)। মিশরের স্বৈরতন্ত্রী শাসক গামাল আবদেল নাশেরের সম্রাজ্যবাদ বিরোধি সমাজতান্ত্রিক আরব জাতিয়তাবাদ-যা ছিল নাজিজম, কম্যুনিজম এবং ইসলামের ককটেল-তা কি আরব বিশ্বে ধর্মনিরেপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ কিছু মাত্রায় বাড়াতে পেরেছে? বরং ১৯৮০ সালের পর, যখন ইরানের ইসলামিক বিপ্লব সফল হল এবং কম্যুনিউস্টরা আফগানিস্তান দখল করলো, ইসলামিক বিশ্বের তরুন সমাজের কাছ "কম্যুনিজম" বর্জ্য পদার্থে পরিণত হয়। নাশেরিজম বাতিল করে নতুন প্রজন্মের কাছে দক্ষিন পন্থী "ইসলামিক আদর্শ রাষ্ট্রের" ধারনাই প্রবল জণপ্রিয় হতে শুরু করে। সেই ক্রম বর্ধমান দক্ষিনপন্থী ট্রেন্ড আজও চলছে। বর্তমানে ইহাই সমস্ত ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের মূল রাজনৈতিক শক্তি।

তাহলে এইধরনের ইসলামিক বামপন্থায় পরম প্রাপ্তিটা কি? দক্ষিন পন্থী ইসলামিক শক্তিগুলিই সব দেশে এই সব বামপন্থী ইসলামিক নামের হাঁসজারু গ্রুপটিকে গিলে ফেলেছে-তিমির তলপেট বলে কথা। ফলে পাকিস্থান বা বাংলাদেশে আজ একটাও বৃহৎ বামপন্থী দল নেই-এদের বুর্জোয়া পার্টি গুলি "আদর্শ ইসলামিক সমাজের" কাছে নাক খঁত দিয়ে বসে আছে। তারতম্যটা শুধু মাত্রার।

পশ্চিম বঙ্গের সিপিএম আন্দোলনেও একই দৃশ্যের পুরনাবৃত্তি। ২৯৫ টা সিটের বিধান সভায় প্রগতিশীলতা এবং ধর্মনিরেপেক্ষতার দাবিদাররা ধর্ম এবং জাত দেখেই পার্থী দিয়ে থাকেন। হিন্দুকেন্দ্রে হিন্দু, মুসলিম কেন্দ্রে মুসলিম পার্থী দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস কখনো সখনো ব্যাতিক্রম দেখালেও সিপিএম কোন দিন হিন্দুপ্রধান এলাকাতে মুসলিম বা মুসলিম এলাকাতে হিন্দু পার্থী দেয় নি। ধর্মীয় পরিচয় যদি বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা হয়, আরো ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা বলে পার্থীর জাতও খুব গুরত্বপূর্ণ সিপিএমের নেতৃত্বে। আমাদের নিজেদের কেন্দ্রেই দেখেছি। মাহেষ্য প্রধান এলাকা-তাই গত চল্লিশ বছরে সিপিএম মাহেষ্য পার্থী দিয়ে এসেছে। অন্যজাতের নেতারা উঠতেই পারে নি স্থানীয় পার্টিতে। অর্থাৎ মানুষের ধর্মীয় বিচ্যুতিগুলির বিরুদ্ধে না গিয়ে, সেগুলো স্বীকার করে নেওয়া হল ভোটের জন্য। ১৯৮৯ সালে কংগ্রেসকে হঠাতে সিপিএম জোট বাঁধে বিজেপির সাথে। বিগ্রেডে জ্যোতিবাবু-বাজপেয়ী-আদবানি একসাথে সভা করলেন। ধান্ধা ক্ষমতার। ফলটা হল এই যে বিজেপি আসন বাড়াল ২ থেকে ৯০। আজ তারা ভারতের বৃহত্তম পার্টি। আর সিপিএম যে ভাগারে ছিল সেখানেই আছে। হিন্দুত্ববাদিদের উত্থানের পেছনে সব থেকে বড় কারন সিপিএমের "ঐতিহাসিক ভুল"। আজও সিপিএমে সেই ট্রাডিশন চলছে-এদের ভোট সঙ্গীরা হয় চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক, না হয় জাতপাতের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির লোকজন। '৯১ সালে এই প্রশ্নটা আমি অনেক সিপিএম নেতার কাছে করেছি। কি করে এবং কি অর্থে মুলায়েম সিং বা লালুপ্রসাদ এর মতন প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা কংগ্রেসের থেকে 'ভাল' যে এদের নিয়ে তৃতীয় শক্তির 'চতুর্থ শ্রেনীর সার্কাস' ইনারা আপামর ভারতবাসীকে উপহার দিতে চান? কম্প্রোমাইজ করার ফলটা এই যে আজ পশ্চিম বঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তসলীমা ইস্যুতেও সিপিএমের ধর্মনিরেপেক্ষ সার্কাস আমরা সবাই দেখলাম। বাঙালীরা ভাগ্যবান-কোন বুদ্ধিমান ক্যারিসমাটিক হিন্দুত্ববাদি বাঙালী নেতা নেই।

ইরান থেকে ভারত-শিক্ষা একটাই। ক্ষমতা দখলের জন্যে বামপন্থীরা ধর্মীয় শক্তিগুলির তোষন করা মাত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং দক্ষিনপন্থার বল্গাহীন উত্থান হয়েছে। ইসলামিক বিশ্বে সেটা আরো দ্রুত হয়েছে কারন ইসলামের নিজস্ব বিকল্প রাষ্ট্র ব্যাবস্থা এবং আইন আছে।

(৩)

কেন ধর্ম সাথে আপস করতে গেলে ধর্ম খেয়ে ফেলছে বামপন্থাকে? আমি ধাপে ধাপে বিশ্লেষন করব।

ইসলাম ধর্ম পালন করা মানে কি? হজ্ব যাত্রা, নামাজ পড়া?

না ইসলাম অনুসারে পুত্র,পিতা,স্বামী, সামাজিক লোক হিসাবে নিজের দ্বায়িত্ব পালন করা? হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রেও এটা খাটে? হিন্দু ধর্ম মানে কি পুজা করা? না আমাদের নানান অস্তিত্বগুলো অনুযায়ী কর্তব্য পালন করা?

আমি কে? পিতা,পুত্র, স্বামী, বন্ধু ইত্যাদি সামাজিক এবং জৈবিক অস্তিত্বের বাইরে আমার কি পৃথক কোন অস্তিত্ব আছে? তাহলে পূজা, নামাজ, হজ্ব ইত্যাদি আমাদের এই সব অস্তিত্বের কোথায় লাগে?

কোরান এবং গীতার রচয়িতারা মোটেও এই অস্তিত্ববাদি প্রশ্নটি গোলান নি। খুব পরিষ্কার ভাবেই সামাজিক দ্বায়িত্বগুলির পালনকেই 'ধর্ম' বলে নির্দেশ দেওয়া আছে। দ্বায়িত্ব, কর্তব্য ছেড়ে পূজা পূজা খেলা গীতাতে নিন্দিত। এখন কেও যদি আদর্শ মুসলমান স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে দ্বায়িত্বপালন করতে চাই-রাষ্ট্রের বৈবাহিক আইন ইসলামিক না হলে সে রাজী হবে কেন? সুতরাং অস্তিত্ববাদির দৃষ্টিতে রাষ্ট্র এবং

সমাজ থেকে ধর্মকে পৃথক করা যাচ্ছে না। তাই ধর্ম থাকবে, আবার ধর্ম নিরেপেক্ষ রাষ্ট্রও থাকবে সেটা অনেকটাই সোনার পাথর বাটি। আমি একজনকে বল্লাম ইসলাম পালনে ক্ষতি নাই, কিন্তু রাষ্ট্রের বৈবাহিক আইন বৃটীশ হবে, সেটা কিভাবে সম্ভব? আমি আগেই দেখিয়েছি নামাজ, হজ্ব ইত্যাদি করে ইসলাম ধর্ম পালন হয় না-ধর্মের আসল পালন স্যোসাল কনট্রাক্টগুলিতে। সুতরাং ধর্মকে মেনে নিলে সে রাজনীতিতে ঢুকবেই। গীতা এবং কোরান দুটোই পলিটিক্যাল এবং স্যোসাল থিসিস। অস্তিত্ববাদির দৃষ্টিতে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের থেকে আধ্যাত্মিকতা আলাদা হতে পারে না। গীতা এবং কোরান, তাই আধ্যাত্মিকতাকে রাষ্ট্রের সাথে আলাদা করে নি। এই ধর্মগ্রন্থ গুলো মোটেও ভুল করে নি। ভুল করেছে বামপন্থী এবং তথা কথিত "ধর্ম ভাল তবুও ধর্ম নিরেপেক্ষবাদি"র দল-যারা ধর্মের সাথে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যার্থ।

তাহলে পাল্টা প্রশ্ন উঠবে-ইউরোপে এবং আমেরিকাতে কিভাবে ধর্ম নিরেপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরটা বোঝা খুবই জরুরী আমাদের ধর্মনিরেপেক্ষ গোষ্ঠির জন্যে। ইউরোপে চেতনা মুক্তির আন্দোলন চলেছে ছয় শতাব্দি ধরে। আমাদের দেশে যুক্তিবাদি আন্দোলন এখনো শৈশবে। এখানকার সিপিএম নেতারা কালীপূজা করেন-হজ্বেও যান! চেতনা মুক্তির আন্দোলনে ধর্মের আদর্শগুলি এবং কুসংস্কারকে সরাসরি আঘাত করার পথেই উনবিংশ শতাব্দিতে স্টুয়ার্ট মিল বা বেন্থাম তাদের ধর্মনিরেপেক্ষ "উলিটারিয়ানিজম" দর্শনের জন্ম দিতে পেরেছেন-যা আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্বরূপ। আমরা সেই সব ধর্মনিরেপেক্ষ আইনগুলি বৃটীশদের কাছ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি-কিন্তু আমাদের সামাজিক যুক্তিবাদের ভিত্তি ইউরোপের উনবিংশ শতাব্দির থেকেও নিম্নমানের রয়ে গেছে। সুতরাং মানুষের চেতনার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ যতক্ষন না পর্যন্ত রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যাক্তি ধর্মের ওপর বিজ্ঞানকে স্থান দিতে রাজী না হচ্ছে, ততক্ষন পর্যন্ত ধর্মনিরেপেক্ষ রাষ্ট্র বা রাজনীতির ভিত্তিই তৈরী হয় না। ক্রিয়েশনিজমকে কেন্দ্র করে এটা আমরা আবার ভালো বুঝলাম। ক্রিয়েশনিস্টরা আমেরিকাতে জিততে পারলো না। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ান এতে বিশ্বাসী। তাবড় তাবড় রিপাবলিকান নেতারা-বুশ, ববি জিন্দাল ইহা চান। তাও আমেরিকাতে ডারউনিজম স্কুলের সিলেবাসে টিকে গেল। ক্রিয়েশনিজমকে আটকানো গেল। এর একটা বড় কারন হল, সংখ্যাগরিষ্ঠ খৃষ্ঠানরা এতে ক্রিয়শনিজমে বিশ্বাস করলেও খুব অল্প কয়েকজন ডারউনিজমকে স্কুল সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতি।

অর্থাৎ ব্যাপার ছিল এই রকম- সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীষ্ঠান এবং যুক্তিবাদিরা ডারউনিজিম চাইছে।

আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীষ্ঠানরা ক্রিয়েশনিজমও চাইছে-কিন্ত ডারউইনবাদিরা এর বিরোধিতা করেছে তীব্রা।

এক্ষেত্রে ফুকোর ক্ষমতার তত্ব অনুযায়ী যহেতু কনসেনসাস বা সাধারন মতামত ডারুইনিজমের পক্ষে, তাই দ্বন্দের কারনে, ক্রিয়েশনিজম টিকবে না। কিন্তু এটা যদি পাকিস্থানে হত? ধরা যাক মৌলবাদিরা দাবি তুললো ডারুইনিজম কোরানের বিপক্ষে, তাই তুলে দিতে হবে (বলাই বাহুল্য -অনেক মুসলীম রাষ্ট্রেই স্কুল সিলেবাস থেকে ডারুইনিজম তুলে দেওয়া হয়েছে কোরান বিরোধিতার আছিলায়)। সেক্ষেত্রে ডারুউনিজম তুলে নিতেই হত-কারন পাকিস্থানের মতন রাষ্ট্রে কনসেনসটা তৈরী হবে "কোরান অভ্রান্ত" এই ধারনাটাকে কেন্দ্র করে-সেটাই ক্ষমতার উৎস। তাই তার বিরুদ্ধে কেও যাবে না। গেলেও উড়ে যাবে।

অর্থাৎ জনসাধরনের চেতনার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ধর্ম এবং ধর্ম্ননিরেপেক্ষতাকে একই সাথে স্বীকার করে নেওয়াটা ধর্মনিরেপেক্ষ শক্তিগুলির রাজনৈতিক আত্মহত্যা। কারন এই ধরনের গোঁজামিলের বিরুদ্ধে দক্ষিনপন্থী শক্তিগুলি দ্রুত নিজেদের ক্ষমতার অবস্থান দৃঢ় করে নেবে। যেহেতু দক্ষিনপন্থী ক্ষমতার উৎস "ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী" কে বামপন্থীরাও স্বীকার করে নিচ্ছে এবং "ঈশ্বরের অভ্রান্ত বানী" রাষ্ট্রের সাধারন কনসেসসাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে ইরানে শাহর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বিপ্লবে কমিনিউস্ট এবং ইসলামিস্টরা একসাথে অংশ নিলেও-পরবর্তী কালে ক্ষমতা ইসলামিস্টদের হাতেই আসে। এবং সেই দক্ষিনপন্থী মোল্লাতন্ত্র অনায়াসেই এক লক্ষ কমিনিউস্টকে হত্যা এবং অত্যাচার করে ধর্মনিরেপেক্ষ শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে। অথচ পৃথিবীর তাবৎ বামপন্থীরা, ইরানের মোল্লাতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ-যেহেতু তা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি। হুগো শাভেজ বা ফিদেল কাস্ত্রো ইরানকে ঢালাও বিপ্লবী সার্টিফিকেট দেওয়ার পথে একবারও ভেবে দেখেন না যে-তাদের সুবিধাবাদি অবস্থান "ঈশ্বরের অভ্রান্ত বানী" কেই শক্তিশালী করছে-যা মুসলিম বিশ্বে দক্ষিনপন্থী ক্ষমতার সাশ্বত উৎস।

আসলে আমাদের উপমহাদেশের বামপন্থীদের মৌলিক চিন্তাশক্তি খুব ই কম। অবশ্য এটা আমাদের জাতিগত ত্রুটি। ফলে ধর্মের ব্যাপারে তারা এঙ্গেলস এবং লেনিনের গাইডলাইনকেই অনুসরন করেন। এই গাইডলাইন হচ্ছে ধার্মিক শ্রমিক বা কৃষকরাও কম্যুনিউস্ট পার্টিতে যোগ দিতে পারবে। এবং আস্তে আস্তে মার্ক্সবাদের মাধ্যমে তারা বুঝতে পারবে শ্রেণীদ্বন্দ এবং ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলি। এটা ইউরোপে চলে-কারন তাদের চেতনামুক্তির আন্দোলন অনেক দিনের। আমাদের উপমহাদেশে এই একই গাইডলাইন ফলো করলে, ধর্মীয় বিচ্যুতি পার্টিকে ধ্বংস করবে। সেটা সিপিএমের মধ্যে আমরা ১০০% দেখেছি। এখানে ধর্মের সাথে আপস করা মানে ধর্মের সাপ এইসব বামপন্দিদের ব্যঙাচীর মতন গিলে ফেলবে।

(৪)

ধর্ম সম্মন্ধে সঠিক অবস্থান নিতে ব্যার্থ হওয়ায়, নতুন প্রজন্মের অধিকাংশ প্রগতিশীলরা বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি ক্রুদ্ধ সেটা আগেও বলেছি। ধর্মীয় মৌলবাদ থেকে সন্ত্রাসবাদ-সর্বত্রই আমেরিকার ভূত দর্শন বামপন্থীদের ছোঁয়াচে রোগ। জন সাধারন বোকা নয়। পাকিস্থান এবং আফগানিস্থানে ইসলামিক মৌলবাদের পেছনে আমেরিকার অবদান এবং অনুদান সবাই জানে। ইরাক আক্রমনে কিভাবে পৃথিবীতে ইসলামিক মৌলবাদকেই উস্কে দেওয়া হল-সেটাও আমরা জানি। কিন্তু তসলীমার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ মুসলিম ফ্যানাটিকদের শান্ত

করতে তাদের বামপন্থী এম পি মহম্মদ সেলিম যখন বলেন তসলিমা আমেরিকার গুপ্তচর-বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইছে। তখন সেটা ভোটের তাগিদে মৌলবাদি শক্তিগুলির সাথে ভয়ংকর রকমের আপস। এতে "ঈশ্বরের অভ্রান্ত তত্ব"কেই মেনে নেওয়া হয়। এবং ঈশ্বর, আল্লারা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু কি না-তাই ইহা একই সাথে হিন্দু মুসলিম সমস্ত মৌলবাদি শক্তিকেই একসাথে সমর্থন। মৌলবাদের একমাত্র ধর্ম মৌলবাদ।

সিপিএম এবং কংগ্রেসের মহিলা নেতৃত্বই ধর্মের বিরুদ্ধে কিছুটা সঠিক অবস্থান নিতে পেরেছে। ইমরানার শ্বশুর তাকে ধর্ষন করলে শরিয়া যখন শ্বশুরকে বিয়ে করার নিদান দেয়-সেই মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে সমস্ত পুরুষ বামপন্থীদের নীরবতা আমাকে অবাক করেছিল। একমাত্র বৃন্দা কারাত ই গর্জন করে উঠে সিপিএমকে সঠিক অবস্থান নিতে বাধ্য করিয়েছেন। কংগ্রেসের রেনুকা চৌধুরীও সেক্স এডুকেশনের বিরুদ্ধে থাকা বিজেপির হিন্দু নেতাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। আসলে ধর্ম নিরেপেক্ষতা ব্যাপারটা পুরুষ নেতাদের কাছে ক্ষমতা দখলের আরেকটা উপায় মাত্র। ধর্ম নিরেপেক্ষ সমাজ নারীর স্বার্থে, কিন্তু পুরুষের স্বার্থের বিপক্ষে। কারন ধর্মই নারীগর্ভে পুরুষের জেনেটিক সারভাইভাল নিশ্চিত করে। ফলে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে থেকে দেখেছি বামপন্থী পুরুষরা ধর্মীয় রাজনীতির বিরোধিতা করলেও, ধর্মের বিরোধিতার ব্যাপারে উদাসীন। ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল দিকটা বামপন্থী নারীরাই নিজেদের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেন-ধর্মের বিরোধিতা তাদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় এবং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা প্রতিবাদ। সুতরাং আমাদের উপমহাদেশে বামপন্থী আন্দোলন যতদিন না মেয়েদের হাতে না আসবে-ততদিন বামপন্থী দলগুলি ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতে যাওয়ার সাহস দেখাবে না। তেমনটা হওয়া খুব কঠিন। কারন সংসার, চাকরী করার পর অধিকাংশ মেয়েদের হাতে রাজনীতি করার মতন সময় বা এনার্জি কোনটাই থাকে না।

(৫)

তাহলে ধর্মের বিরুদ্ধে সঠিক অবস্থান কি হবে? ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে দাও, ধর্মকে গুঁড়িয়ে দাও বললে কিছুই হবে না। হিতে বিপরীত হবে। কারন ধর্ম আমাদের উপমহাদেশের মানুষের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ধর্ম যেসব সামাজিক, নৃতাত্বিক এবং মানসিক দাবি মেটাচ্ছে-সেটা সঠিক এবং বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বোঝা দরকার। এটা বুঝতে হবে ধর্মগুলির সব কিছুই প্রতিক্রিয়াশীল নয়। এগুলো ঐতিহাসিক প্রতিবাদি আন্দোলন ও বটে। জনগনকে বোঝানো দরকার ধর্ম তাদের যেসব দাবি মেটাচ্ছে, তা বিজ্ঞান দিয়ে আর ভালো ভাবে মেটানো সম্ভব। অর্থাৎ তাদের চেতনা মুক্তি ঘটাতে বিবর্তনের এই ধারাটিকেই বোঝাতে হবে। আমি প্রশ্নউপনিষদের বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং বোঝাবো উপনিষদের প্রশ্নগুলি-যেমন প্রান কি? প্রানের স্বরুপ কি তা বিজ্ঞান দিয়েই ভাল বোঝা যায়। মুসলমানদের বোঝাতে হবে হজরত মহম্মদ যা করেছিলেন, সেটা ছিল সেই যুগের দাবী। এবং তিনি তার কাজটি ভালোই করেছেন। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারে ফলে, বিজ্ঞান দিয়েই বর্তমান যুগের দাবী মেটাতে হবে। সেখানে কোরান নিয়ে আসা মানে সভ্যতার সংঘাতে মুসলীমরা পিছিয়ে পড়বে। কোরান বেদ অভ্রান্ত এসব মানা যাবে না-কারন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অভ্রান্ত, পরম সত্য বলে কিছু হতে পারে না। পরম সত্যে বিশ্বাস মারাত্মকতম বিচ্যুতি। আর সেটা যদি সমাজ সংক্রান্ত হয়, তাহলে শাশ্বত সত্য বলে আরোই কিছু হয় না-কারন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বলে সমাজ দ্রুত পালটাচ্ছে। জেনেটিক্সের উন্নতিতে বিয়ে বা সংসারের ধারনাটাই হয়ত আগামী শতাব্দিতে লুপ্ত হবে। জেনেটিক্স যদি মানব মনের মৃত্যুকে আটকাতে পারে, পরকালের ধারনাটাই লোপ পাবে।

মোদ্দা কথা আমাদের উপমহাদেশে চেতনা মুক্তির আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই।

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র মানে রাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যাবস্থাকে শুধু সরকারী করা নয়-এর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সমাজতান্ত্রিক করা। সেটা না হলে সমাজতন্ত্র বলে কিছু নেই। যেটা আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ান এবং পূর্ব ইউরোপে কমিনিউস্ট ব্লকের পতন থেকে ভাল ভাবে জেনেছি। ওখানে সমাজতন্ত্র ছিল-কিন্তু সমাজতান্ত্রিক মানুষ ছিল না। মানুষকে সমাজতান্ত্রিক বানানো বর্তমানে প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। আমি মনে করি না সেটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়ে সম্ভব। তাতে খামোকা স্টালিনের মতন দৈত্য তৈরী হবে-প্রচুর লোক খুন হবে বা অনাহারে মারা যাবে।

বরং বিজ্ঞান এবং গণতন্ত্রের পথেই সমাজতান্ত্রিক মানুষের আগমন আসন্ন। বাজার থাকলেও বাজার অর্থনীতির পতনআজ ত্বরান্বিত-কারন গোটা পৃথিবীটাই একটা সিঙ্গল মার্কেট হয়ে যাচ্ছে এবং সেই বাজারে অনিশ্চয়তা হ্রাস পেতে পেতে শুন্য হবে কম্পুউটার এবং ইনফর্মেশন এক্সপ্লোশনে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে মানুষের চাহিদাগুলো অতি সহজেই মেটানো সম্ভব হবে-সেক্ষেত্রে শ্রেনী দ্বন্দ, মানুষের ধনতান্ত্রিক প্রয়াস হ্রাস পাবে। ফলে প্রযুক্তির হাত ধরে যখন সমাজতন্ত্রের আগমন ত্বরান্বিত-তখন আমাদের বামপন্থীদের মেহনতি মানুষের জন্য লাশ হওয়া এবং লাশ ফেলার বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি এক তৃতীয় শ্রেনীর অবুঝ সার্কাস ছাড়া কিছু নয়। আসুন আমরা বিজ্ঞানের চেতনায় মানুষকে উদবুদ্ধ করি-জীবনের প্রতিটা সিদ্ধান্ত এবং সমাজের উন্নতির পথে বিজ্ঞানকেই আমরা হাতিয়ার করি। আমাদের সমাজে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গণতন্ত্রের বিকাশ হলে, নিশ্চিত ভাবেই আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবো। সেটাই প্রযুক্তি নির্ভর সমাজের ভবিষ্যত।